বিজ্ঞান

বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। অর্থাৎ যে নিয়মে প্রকৃতি সৃষ্টি, ক্রিয়াশীল ও পরিবর্তনশীল সেই নিয়ম বা কোড হচ্ছে বিজ্ঞান।অথবা, প্রকৃতির সৃষ্ট বা প্রকৃতিজাত জীব ও জড়বস্তুর সৃষ্টি, বিকাশ, পরিবর্তন বা রূপান্তরের নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান। অতঃপর, প্রকৃতিতে ও প্রকৃতিজাত জীব ও জড়বস্তুতে বিদ্যমান নিয়ম বা নিয়ম সমষ্টি হচ্ছে বিজ্ঞান। প্রকৃতি যেমন বস্তুগত সত্য, প্রকৃতিজাত জীব ও জড় বস্তুও তেমন বস্তুগত সত্য। তাই বিজ্ঞান হচ্ছে বাস্তব অর্থাৎ সত্য। সুতরাং, সত্য বৈ মিথ্যা হওয়ার সুযোগহীন বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান। অর্থাৎ বস্তুগতভাবে যা নাই বা ছিল না তা অসত্য। সুতরাং, বিজ্ঞানী মাত্রই বস্তুতন্ত্রী তথা বস্তু বা বস্তুনিচয়ের তা হোক জীব বা জড় তা গঠনের নিয়ম এবং বস্তুর পরিবর্তন বা রূপান্তরের নিয়ম মান্যকারী ও তদানুরূপ নিয়মের অনুসারী। তাই, বস্তুগত সত্যানুসন্ধানী, সত্যান্বেষী, সত্যাশ্রয়ী এবং সত্যের পথের পথিক বা অভিযাত্রী হচ্ছেন বিজ্ঞানী। তাইতো, কোনো বস্তু গঠনের নিয়ম জেনে-বুঝে ও সেই বস্তু সহ অপরাপর বস্তু গঠন ও পরিবর্তনের নিয়ম জেনে-বুঝে ঐ নিয়ম অনুসরণ করে নতুন নতুন বস্তু উদ্ভাবনে সক্ষম বটে বিজ্ঞানী। তাই বিজ্ঞান কেবল নিয়ম জেনেই ক্ষান্ত নয় বরং বিজ্ঞান, জ্ঞাত নিয়মকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন বস্তু উদ্ভাবনেও ক্রিয়াশীল।

উল্কা বা উল্কা পিন্ড, গ্রহানু, উপগ্রহ, গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্র পুঞ্জ ইত্যকার বিষয়াদি নিয়ে প্রাথমিকভাবে প্রকৃতি গঠিত। তবে প্রকৃতিজাত নানান বস্তু এবং প্রাণীও প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট বলে এসবও প্রকৃতির অংশ। তাইতো মানব দেহ সৃষ্টি , সচল ও বিকল হওয়ারও নিয়ম আছে। অন্যান্য বস্তুর গঠন, পরিবর্তন, রূপান্তর ইত্যকার বিষয়াদির নিয়ম আছে। তাইতো, নিয়মহীনতার সুযোগ নাই যেমন প্রকৃতিতে তেমন প্রকৃতিজাত বিষয়ে।

নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটলে দুর্ঘটনা অনিবার্য, এটিও নিয়ম। কাজেই, প্রকৃতিও এক গুচ্ছ নিয়মের সমষ্টি মাত্র।

তাইতো, বস্তু গঠনের নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান; বস্তু বিভাজনের নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান: বস্তুর পরিবর্তনের নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান; বস্তুর রূপান্তরের নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান; বস্তুর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান; বস্তুর পুনর্গঠনের নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান; বস্তুর গতি হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান; এবং বস্তুর রাসায়নিক বিন্যাশের নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান।

অতঃপর, বিজ্ঞানকে জানা, বিজ্ঞানকে বুঝা, বিজ্ঞানকে মান্য বা যত্ন করা ও বিজ্ঞান অনুশীলন করাই হচ্ছে একজন বিজ্ঞানীর কাজ। কাজেই, **অজানাকে জানা, পুনঃপুন পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত সত্যে উপনীত হওয়া বৈ অন্ধ বিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ নাই বিজ্ঞানীর**। বিশ্বাস প্রমাণের ধার ধারে না। কিন্তু, প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞান কোনো কথা বলে না। বিশ্বাস অন্ধ কিন্তু বিজ্ঞান আলো। তাইতো, আলোর পথের যাত্রী বিজ্ঞানীরা সাহসী বটে ঘোর অন্ধকারেও। বিজ্ঞান বিদ্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল খ্রীষ্ট্রীয় যাজকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত ব্রুণো, সের্ভেৎরা তার প্রমাণ।

বিপরীত শক্তির ঐক্য হচ্ছে বস্তু। তাই, দ্বান্দ্বিকতার নিয়মাধীন বিষয় হচ্ছে বস্তু। বস্তুর মৌলিক ইউনিট হচ্ছে এটম। তবে এটমের মধ্যে আছে সাব এটম, অর্থাৎ নেগেটিভলভি চার্জড-ইলেক্ট্রোন, পজেটেভলি চার্জড-প্রোটন, আর নিউট্রোন হচ্ছে নিউট্রাল। তাই এটমের মধ্যে বিপরীত শক্তির অবস্থান আছে বলেই এটম দ্বান্দ্বিকতার অধীন, বা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কাধীন এটম হচ্ছে বস্তুর মৌলিক রূপ। সুতরাং, এটমে ইলেক্টোম্যাগনেটিজম বা ইলেক্টোম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। যে কারণে বস্তু

মাত্রই গতিশীল, রূপান্তরশীল ও পরিবর্তনশীল। সুনির্দিষ্ট মাত্রার তাপ ও চাপে প্রতিটি বস্তু পরিবর্তিত হয়।

আবার প্রতিটি বস্তুর ভর আছে বলে প্রতিটি বস্তুর অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা অর্থাৎ গ্রেভিটেশন পাওয়ার আছে। তাই, প্রকৃতির বস্তুগুলোতে আন্তঃক্রিয়ার ক্ষমতা আছে। তাইতো, প্রকৃতির বস্তু নিচয় একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, ও সমন্বিত । সেজন্য , একের তাপে-চাপে অপরাপর বস্তুর পরিবর্তন ও রূপান্তর হয়। তবে পরিবর্তনের প্রাথমিক কারণ কিন্তু বস্তু বিশেষের অভ্যান্তরীণ ক্রিয়া তথা দ্বান্দ্বিকতা। দ্বান্দ্বিক সম্পর্কাধীন বস্তুর পরিবর্তন বা রূপান্তরের ফলাফলও কিন্তু একটি নিয়মের অধীন। তাই, গোল আলুতে নয়, মুরগির ছানা পেতে হলে মুরগির ডিমে আবশ্যকীয় তাপ দিতে হয়।

কথা বলা শুরু হওয়া মাত্র শিশুরা যেমন দৃশ্যমান প্রতিটি বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয় এবং প্রত্যেকটি বস্তু ও বিষয়ে কি ও কেন দ্বারা প্রশ্ন করে, তেমন মানবজাতিও তার শিশুকাল হতে জগত ও জাগতিক বিষয়াদি জানতে ও বুঝতে চেয়েছে তাও নিশ্চিত। জগত ও জাগতিক বিষয়াদি জানতে- বুঝতে চাওয়ার চিন্তা ও ক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বলা হয়। কিন্তু জানতে চাইলেইতো সব কিছু সব সময় জানা-বুঝার সুযোগ নাই। জগত ও জাগতিক বিষয়াদি সৃষ্টি বা রূপান্তরের হেতুবাদ জানার মতো উপযুক্ত তথ্য-তত্ত্ব এবং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো যন্ত্রপাতি বা প্রতিষ্ঠানাদি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা সেসব সূত্র-তত্ত্ব নিশ্চিত করার উপযুক্ত বস্তুগত ভিত্তি ও সুযোগ-সুবিধা পুঁজিতন্ত্রের পূর্বে ছিল না বা পুঁজিতন্ত্রের আগে সে সব থাকার উপযুক্ত কারণ ছিল না। উল্লেখ্য- পুঁজিতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় তেরশত সালে রোমান সাম্রজ্যে।

অতঃপর, প্রায় দুই লাখ বছর বয়সী মানবজাতি জীবন, জগত তথা জগত ও জীবনের সৃষ্টি বিকাশ ইত্যকার বিষয়াদির কার্যকারণ অবহিত হতে পারেনি পুঁজিতন্ত্র বিকাশের আগে। যদিচ, মানবজাতিকে শ্রেণী শ্রেণীতে ভাগ-বিভাজন কারী প্রভুশ্রেণী নিজেদের পরজীবীতার প্রভুত্বকে জায়েজীকরণে পৃথিবী, সুর্য, চন্দ্র ইত্যাদি সৃষ্টি এবং মানবজাতির সৃষ্টি বিষয়ে সত্য নয় জেনেও ভয়ানক মিথ্যার বেশাতি করে প্রচুর রাজনৈতিক গাল-গল্প রচনা ও রটনা করেছে। বিস্ময়কর হলেও এটাই বাস্তব যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা ও অগ্রগতিতে মানুষ যখন চাঁদে পা রেখেই ক্ষান্ত হয়নি বরং মহা-বিশ্বকে জানার জন্য স্পেস ষ্টেশনে বসবাস করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করছে এবং তা জানা সত্ত্বেও এখনো বেশীরভাগ মানুষ জগত, জীবন বিষয়ে ঔসব ভুয়া-মিথ্যা ও বানোয়াটি গাল-গল্প বিশ্বাস করছে। কারণ, ব্যক্তিমালিকানার পত্তনকারী প্রভুশ্রেণী যে মিথ্যার বেশাতি করে দাসদের মালিক বনেছিল দাসদের শ্রমে নিজেদের পরজীবিতার বিলাশী জীবন যাপনের জন্য সেই ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্র মিথ্যার বেশাতি বৈ সত্য বলে টিকে থাকতে পারবে না এ সমাজের সুবিধাভোগী-অধিপতি পুঁজিপতি শ্রেণী।

তাই, ভুমি দাসত্বের সামাজিক ব্যবস্থাকে পরাজিত ও পরাভূত করে আধুনিক কারখানা সমৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী পুঁজিপতি শ্রেণীও শোষক বৈ অন্য কিছু নয়। অতঃপর, সাবেকী পরজীবিদের পরাভূত করলেও বা নিজেদের স্বার্থে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা করলেও শোষণজনিত কারণেই সত্যবাদী হতে পারেনি পরজীবি পুঁজিপতি শ্রেণীও। আবার ব্যক্তি মালিকানার বিরোধী নয় বলে বৈজ্ঞানিক সত্য জানার পরেও কেবলই ব্যক্তিগত মালিকানা সংরক্ষায় বুর্জোয়া শ্রেণী যারপর নাই কলা-কৌশলে বিজ্ঞানকেও ব্যবহার করছে জাগতিক বিষয়ে দাসপ্রভুদের বানোয়াটি রটনাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে জাহির করতে। কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী!

অজস্র পণ্যের সমাজ হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ। এই অজস্র পণ্য উৎপন্নের জন্য আধুনিক শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য আবশ্যকীয় প্রকৌশলী, হিসাববিদ, চিকিৎসাবিদ, আইনবিদ, করনিক ইত্যকার মানবিক যন্ত্র উৎপন্নে পুঁজিপতি শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে, বিজ্ঞান জানা, বিজ্ঞান বুঝা ও বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য পাওয়া গেল প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা। এমনকি, স্কুলেই পঠিত হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান সমেত পদার্থ, রসায়ন, জীব, তড়িৎ প্রযুক্তি ইত্যকার বিষয়াদি।বিশ্ব বিদ্যালয় ও সরকারীভাবে যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ করতে হল তেমন ঔষধ সহ নানাবিদ শিল্পের মালিকরা নিজেরই বাধ্য হল নিজেদের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরী ও গবেষণা কর্মী সৃষ্টি করতে। ফলে, পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো বিজ্ঞান। তাই, বিজ্ঞান চর্চার কিছুটা অনুকুল সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি হল।

বিজ্ঞান যেহেতু তথ্য-প্রমাণ নির্ভর পরীক্ষিত সত্য। তাই, জগত ও জীবনের সৃষ্টি ও বিকাশ বা পরিবর্তন ও রূপান্তর বিষয়ে পরজীবিতার স্বার্থে অতীতের বানোয়াটি গাল-গল্পের অসারতা প্রমাণ করে কার্যত প্রভু ও লর্ডদের সৃজিত ও প্রচলিত তদ্বিষয়ক ভুয়া মতবাদিতার বিরুদ্ধে সাড়ম্বরে বিদ্রোহ করেছিল বিজ্ঞান। পুঁজির বিকাশের শর্তে বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে যোগ দিয়েছিল বিদ্রোহী বিজ্ঞানের সাথে। ফলে, প্রগতিশীল বুর্জোয়া ও বিজ্ঞানের মিতালীতে সূচিত ও প্রসারিত হয়েছিল ইহলৌকিকতার (Secularism) রাজনীতি- যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ।

শ্রমিক শ্রেণী পণ্য উৎপাদন করলেও পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পণ্যের মালিক হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী। তবে, পুঁজিপতিকে কেবল পণ্যের মালিক হলেই চলে না, বরং পণ্য বিক্রি করে কেবল মুনাফা নয় বরং পণ্য উৎপাদনে

বিনিয়োগকৃত টাকাটা ফেরৎ আনতে হয়। না হয় পুঁজির অস্তিত্ব টিকে না। তাই পণ্য বিক্রির জন্য আবশ্যক হচ্ছে বাজার। পুঁজির অস্তিত্ব সংরক্ষায় তথা পণ্য বিক্রির তাড়া ও তাড়নায় ইউরোপের পুঁজিপতি শ্রেণী বাধ্য হয় বাজার খুঁজতে। এই রূপ খোঁজাখুঁজিতে ভাস্কোদা গামা আসে ভারতে আর কলম্বাস আবিস্কার করে আমেরিকা ১৪৯২ সালে। আমেরিকা আবিস্কারের পূর্বে আমেরিকার মানুষ যেমন পৃথিবীর এ অংশকে জানতো না তেমন আল্টান্টিকের এ পাড়ের মানুষেরা অবগত ছিল না সমগ্র পৃথিবী বা পৃথিবীর ব্যাস সম্পর্কে।

পুঁজিতন্ত্রের বৌদলতে মানবজাতি সমগ্র পৃথিবীকে জানার পরেই একদা যাজক তবে বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস ১৫৪৩ সালে মৃত্যুর আগে তার বিখ্যাত বই '*On the Revolutions of the Celestial Spheres,*' লিখে প্রমাণ করলেন পৃথিবী নয় , বরং সূর্য হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্র । অর্থাৎ কোপার্নিকাসের পূর্বেকার এদ্বিষয়ক বক্তব্য তথা পৃথিবী হচ্ছে কেন্দ্র তাই পৃথিবী স্থির এবং পৃথিবীকে আলো দেওয়ার জন্য সুর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে রূপ বানোয়াটি মতবাদ ভুয়া বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলেন বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস।

আর এখনতো আমরা জানি যে সূর্যের গতি হচ্ছে সেকেন্ডে ২০০ কিলোমিটার, আর পৃথিবীর গতি হচ্ছে সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিলোমিটার। আমরা এও জানি যে, সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর প্রয়োজন হয় ৩৬৫ দিনের কিছু বেশী সময়। পুঁজিতন্ত্রের পূর্বে কেউ জানতো না যে, পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে ৬৩৭৮ কিলোমিটার আর ভর হচ্ছে 5.97219×10^{24} kg। তবে সূর্যের ব্যাস হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ বেশী; আর সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের ৩৩০, ০০০ গুণ বেশী যা সৌরজগতের মোট ভরের ৯৯.৮৬%। আমরা এটিও জানি যে, সূর্য হচ্ছে উত্তপ্ত গ্যাসের একটি বৃহৎ বল। এই গ্যাসের ৭২% হচ্ছে হাইড্রোজেন

আর ২৬% হচ্ছে হিলিয়াম। তবে এর কেন্দ্রে পারমানবিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন অন্যান্য উপাদানে পরিণত হয় । সূর্যের কেন্দ্রে গ্যাসগুলো শক্তিতে পরিণত হয়। এই শক্তি সূর্যের আবহমন্ডলে সঞ্চারমান এবং সৌরমন্ডলে তাপ ও আলো হিসাবে ছড়ায়। সূর্যের এই শক্তি তথা তাপ এবং তাপের ইলেক্ট্রোম্যাগন্যাটিক বিকীরণ –আলো এর হেতুবাদেই মূলত পৃথিবীর তাবৎ কিছুর উদ্ভব ও রূপান্তর হচ্ছে।

পণ্যের আবশ্যকতায় পুঁজিপতি শ্রেণীকে কেবল প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা করে তদ্বিষয়ে অবগত হলেও চলে না। বরং পণ্য পরিবহনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার যতোটা আধুনিকায়ন করা যায় ততোই পুঁজির সঞ্চালন গতি বাড়ে। যদিও সঞ্চালনে পুঁজি উৎপন্ন হয় না তবু সঞ্চালন ছাড়া পুঁজি হয় না। তাই, পণ্যের পরিবহনে যতোই আধুনিকায়ন হয় ততোই পুঁজির সঞ্চালন গতি বাড়ে, আর সঞ্চালনের গতি যতো বাড়ে ততো পুঁজির প্রবৃদ্ধির হার বাড়ে। তাইতো, পুঁজির সঞ্চালন শর্তে তথা পরিবহনের সুবিধার্থে ১৭১২ সালে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম ব্যবহৃত হয় বাস্পীয় ইঞ্জিন, তবে ১৭৮১ সালে এমন বাস্পীয় ইঞ্জিন তৈরী হয় যা উৎপন্ন করে অবিরাম চ্রকাকারের গতি। ফলে, নৌ–পরিবহনে বিপ্লব সাধিত হয়। পুঁজিপতি শ্রেণী রেল ব্যবস্থার প্রবর্তন করে–১৮০৪ সালে লন্ডনে। তবে মোটর গাড়ীর ব্যবহার শুরু হয় ১৭৬৮ সালে কিন্ত মোটর কার তৈরী হয় ১৮০৭ সালে। বিমান আবিস্কার হয় ১৯০৩ সালে, আর এখনকার নাসার আবিস্কৃত নিউ হরাইজোনের গতি ঘন্টায় ৫০ হাজার মাইল। একই কারণে অর্থাৎ পুঁজির দ্রুত হতে দ্রুততম সঞ্চালনের সুবিধায় দ্রুততম সময়ে যোগাযোগ নিশ্চিতিকরণে ১৮৪৯ সালে উদ্ভাবনী ক্রিয়া শুরু হলেও কার্যত ১৮৭৬ সালে চালু হয় টেলিফোন এবং ১৯৭৩ সালে মোবাইল ফোন। ১৯৭০ এর দশকে চালু হয় নেট।

পণ্য উৎপাদনী ও বিনিময় প্রক্রিয়ায় শক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। তাইতো, ১৬০০ সালে স্থির বিদ্যুৎ শব্দটি ভাষায় যুক্ত হয় আর বিদ্যুতের বাতি আবিস্কৃত হয় ১৭৫৯ সালে। প্রবাহমান শক্তি তথা বিদ্যুৎকে সংরক্ষণের জন্য ১৮০০ সালে উদ্ভাবিত হয় ব্যাটারী। এখনতো বিদ্যুতের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে সোলার সিস্টেম।

পুনরুৎপাদন পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার ২ টি শর্তের একটি। অতঃপর, উৎপাদন বা পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র যতো বাড়ানো যায় ততোই পুঁজি রক্ষিত ও প্রবর্ধিত হতে পারে। তাই, নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন করা ছাড়া গত্যান্তর নাই পুঁজির গোলাম পুঁজিপতি শ্রেণীর। তাইতো হালের কম্পিউটার হতে রেডিও, টিভি ইত্যাদির উদ্ভাবনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার ফসল নানান জনের নানান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্র সূত্রায়িত হওয়ার প্রেক্ষিতে। বস্তু মাত্রই ভর সম্পন্ন। তাই, দুটি বস্তুর মধ্যে থাকে আকর্ষণ – যা গ্রেভিটেশন নামে স্বীকৃত তা ১৬৮৭ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন নিউটন ; এবং ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন সূত্রায়ন করেন আপেক্ষিকতার সাধারণ সূত্র। বস্তুর ক্ষুদ্রতম কনা এটম আবিস্কৃত হয় ১৮০৫ সালে। তবে এটমের সাব এটম –ইলেক্ট্রোন আবিস্কৃত হয় ১৮৯৭ সালে আর এটমের আরেকটি সাব এটম– প্রোটন আবিস্কৃত হয় ১৯১১ এবং নিউট্রোন আবিস্কৃত হয় ১৯৩২ সালে। এছাড়া, মহাবিশ্বে ১১৮ টি এবং পৃথিবীতে ৯৮ টি মৌল পদার্থ বা ইলিমেন্ট এযাবৎ আবিস্কৃত হয়েছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপে–তাপে উল্লেখিত সংখ্যক ইলিমেন্টের সংযোজন ও বিন্যাসে নানান পদার্থ ও প্রাণী তৈরী হয়। এমনকি শক্তির কোনোরূপ ক্ষয় না ঘটিয়ে এরা পরস্পরে রূপান্তরিত হতে পারে।

অতঃপর, বিপরীত শক্তির ঐক্য হচ্ছে বস্তু। বস্তুতে ইলেক্ট্রো–ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেমন আছে তেমন বস্তুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ আছে। তাইতো, বস্তু মাত্রই দ্বান্দ্বিক নিয়মের যেমন অধীন তেমন পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত।

ফলে, এক বস্তুর ক্রিয়া যেমন অপর বস্তুর প্রতিক্রিয়ার কারণ তেমন বস্তু মাত্রই গতিশীল দ্বান্দ্বিক নিয়মেই। কাজেই, কেবলমাত্র পৃথিবীই নয় বরং সমগ্র মহা বিশ্বের বস্তু সমষ্টি একই নিয়মের অধীন। বস্তুর গতির নিয়ম সহ নানাবিদ আবিস্কার করতে করতেই হালে হকিংসরা বিগ-ব্যাংগ সূত্রের তত্ত্বায়ন নিশ্চিত করেছেন। তবে, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থ বৈ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগে সম্মত নয় পুঁজিপতি শ্রেণী, তাই বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব জানা সত্ত্বেও আদৌ মানবজাতি জানে না বিগ-ব্যাংগের কারণ বা এমনকি এখনো জানতে পারেনি ডার্ক এনাজি ও ডার্ক হোল সম্পর্কে যথার্থ তথ্য ও তত্ত্ব।

তবে, পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় নিত্য নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগের জন্যই পুঁজিপতি শ্রেণী আগ্রহী বলে পুঁজিতন্ত্র পদার্থগুলোর রূপান্তর ও পরিবর্তনের নিয়ম জেনে সেই নিয়মের কার্যকারিতায় ক্রমাগত নতুন নতুন পণ্য বানিয়ে পণ্যের জোয়ারে দুনিয়াকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরাই মন্দায় আক্রান্ত হয় বারংবার। কার্যত, সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে গিয়ে বিজ্ঞানের বৈরীতার মুখে নিপতিত হয়ে প্রতিক্রিয়াশী বুর্জোয়া শ্রেণী বিজ্ঞানকে শৃংখলিত করতে চায় কেবল পুঁজির শিকলে নয় বরং বুর্জোয়াদেরই পরিত্যাক্ত ও পরাজিত জীব ও জগত বিষয়ে বানোয়াটি গাল-গল্পের সাবেকী মতবাদিতার বেষ্টনিতে। তাইতো, বৈজ্ঞানিক উপকরণাদি ব্যবহারে উৎসাহী হলেও বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতার তথা জগত ও জীবনকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা-বুঝার ঘোরতর বিরোধী বটে ভন্ড বুর্জোয়া শ্রেণী।

উল্লেখ্য, পুঁজিতন্ত্রেই আধুনিক মেডিকেল সাইয়েন্সের সূচনা ও বিকাশ হয়। তাইতো, কোষ তত্ত্ব তত্ত্বায়িত হয় ১৮৩৯ সালে, বিবর্তনবাদ ১৮৫৯ সালে এবং বিংশ শতাব্দীতে আবিস্কৃত হয় ক্রোমোজম, ডি এন এ ইত্যাদি এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কৃত্রিম প্রাণ, হালে গবেষণাগারে প্রস্তুত

করেছে মানব মস্তিষ্ক। একথা ঠিক যে, কোনো বস্তুর রাসায়নিক সংবিন্যাস জানা গেলে মৌলিক উপাদান থেকে তা তৈরী করা সম্ভব। মেডিকেল সাইন্স ইতোমধ্যে মানব দেহের জিন চিত্রও জেনে গেছে । তাই, বিজ্ঞানীরা মানুষের মৃত্যুকেও পরাজিত করার ঘোষণা দিতে সক্ষম হয়েছে। পুঁজিতন্ত্রে বিত্তবানরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বহু বছর বাঁচতে চাইবে কিন্তু সমাজতন্ত্রে যেহেতু অর্থ থাকবেনা বা বেচা-কেনা থাকবে না সেহেতু সকলেই আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তথা সামগ্রীকভাবে সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ফলে, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে দিয়ে সকলকে আজীবন যৌবনে ভরপুর ব্যক্তি হিসাবে বাঁচিয়ে রাখতে খুব একটা কষ্ট হবে না সমাজতান্ত্রিক সমাজের।

পণ্য উৎপাদনের জন্য হাতিয়ারাদির যতোই বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করা যায়, ততোই শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ে বলে পণ্যে শ্রম নিষিক্ত হয় কম। তাই, পণ্যের মূল্যও কম হয়। তাই, প্রতিযোগিতামূলক পণ্য বাজারে টিকে থাকার জন্য পণ্য উৎপাদনে যতো বেশী বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদি ব্যবহার করা যায় ততোবেশী পণ্য যেমন উৎপাদিত হয়, তেমন আবার পণ্য মূল্য কম হওয়ায় তা সহজেই বাজারে বিক্রি হয়। উল্লেখ্য, ঢাকার বাজারে হাতে ভাজা এক কেজি মুড়ির দাম একশত টাকা অথচ, মেশিনে ভাজা এক কেজি মুড়ির দাম ষাট টাকা। অর্থাৎ মুড়ি ভাজায় মেশিনের ব্যবহার ৪০% শ্রম সাশ্রয়ী। অতঃপর, পুঁজিপতি শ্রেণী বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদির উন্নয়ন ও উন্নতি সাধন না করে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না । তবে, বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদির যতোই উন্নতি সাধন করা হয়, ততোই উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু সমানহারে বাজার বাড়ার সুযোগ নাই বলে পুঁজিপতি শ্রেণী অতি উৎপাদন সমস্যায় তথা মন্দায় নিপতিত হয়। মূলত, মন্দা হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদির বিদ্রোহ। অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে

পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তিমালিকানার বিপরীতে বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদির উপযুক্ত ও পরিকল্পিত ব্যবহারের উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের সামাজিক মালিকানা তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বস্তুগত ভিত্তি সৃষ্টি করে বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদি। স্ববিরোধীতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত পুঁজিপতি শ্রেণী বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদির উন্নতি সাধন না করে যেমন স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না, তেমন বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদির যতোই উন্নতি সাধন করে ততোই পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিপতি শ্রেণী উভয়ের বিনাশের বস্তগত ভিত্তি যেমন মজবুত তেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর বিলুপ্তির রাস্তাকে প্রশস্ত করছে। **কাজেই, বিজ্ঞান হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ ও ধ্বংসের অন্যতম একটি মুখ্য কারিকা শক্তি।**

পুঁজিতন্ত্রী সমাজের হেতুবাদে যেমন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদির উদ্ভাবন ও বিকাশ হয়েছে, তেমন পুঁজিস্বার্থ ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পুঁজি বিনিয়োজিত না হওয়ার কারণে পুঁজিতন্ত্রী সমাজে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া, বিজ্ঞান চর্চা যতো বেশী হবে ততো বেশী পরিমাণে অবৈজ্ঞানিক বিষয়াদি তথা জগত, জীব ও জীবনের ক্রিয়াকলাপ বা সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রভুদের সৃজিত ভুয়া গাল-গল্পদাদির অসারতা প্রমাণিত হবে বিধায় শোষক শ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তাই, বিজ্ঞান চর্চার বিপরীতে যতোভাবে সম্ভব সাবেকী মতাদর্শাদির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সাধনে যাবতীয় আঞ্জাম করে যাছে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী।কিন্তু বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদি ছাড়া যেহেতু পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর একদম চলে না সেহেতু স্ববিরোধীভাবে হালের নেট সহ বিজ্ঞানের শক্তিকে কবুল করতে হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীকে। এমতস্ববিরোধীতায় নিপতিত স্বার্থান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী পরাস্ত হওয়া ছাড়া বিজয়ী হওয়ার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি, তা আবিস্কৃত হয়েছে এই পুঁজিতন্ত্রেই । তাই, উদ্বৃত্ত-শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য হচ্ছে পুঁজি এটি পুঁজির কোড বা নিয়ম। পুঁজির নিয়মের আবিস্কারক মার্কস পুঁজিতন্ত্রী সমাজের নিয়ামাদি যেমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন তেমন সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম আবিস্কার করেছেন। অর্থাৎ- উৎপাদন সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদনের হাতিয়ারাদির বিদ্রোহের পরিণতি হচ্ছে নতুন সমাজের উদ্ভব। অতিতের সমাজ সমূহের পরিবর্তনের এই বৈজ্ঞানিক কারণ আবিস্কার করার মাধ্যমে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের মানদন্ডে ব্যাখ্যা করে কার্যত পুঁজির কোড এবং সমাজ পরিবর্তনের কোড আবিস্কার করে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি-সমাজতন্ত্র এই রূপ সূত্রায়নের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কার করেছেন মার্কস।

শোষক শ্রেণী নিজের সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করতে কখনো রাজী হয় না । কিন্তু, তাই বলে অতিতে শোষক শ্রেণী টিকে থাকেনি, পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীও টিকবে না বরং বৈজ্ঞানিক নিয়মেই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ঠাঁই নিবে। কিন্তু, বিদায়ের আগে টিকে থাকার সকল অপচেষ্টা করছে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী। তাই, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারাদির ব্যবহার করা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যতোরকম প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা যায় তার সবটাই করছে। তারা ভয় পাচ্ছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রকৃত ধারক শ্রমিক শ্রেণীকে। তাইতো, শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্তকরণে মার্কসের আবিস্কৃত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে বিকৃতকরণে লেনিন গংদের ভাড়া করে ' মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' নামীয় মতাদর্শ সৃজন করেছে। অথচ, মতবাদিতা বা মতাদর্শ এবং বিজ্ঞান সমার্থকতো নয়, বরং বিপরীতই কেবল নয়, বরং বিজ্ঞানের যতোটা বিকাশ হবে পরজীবীদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষায় তথাকথিত মহান ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক প্রসূত ও সৃজিত মতাদর্শের ততোটা বিনাশ হবে এবং শেষত সকল

মতবাদিতা তথা লেনিনবাদ সমেত সকল মতাদর্শের সমূলে বিনাশ সাধন করে জয়লাভ করবে বিজ্ঞান মূলত বিজ্ঞানেরই নিয়মে। কারণ বিজ্ঞান কেবল বাস্তব সত্যই নয় বরং সার্বজনীন; আর মতাদর্শ কেবল বানোয়াটি মূলে রচিত নয় বরং খুবই সংকীর্ণ স্বার্থের সংকীর্ণ গন্ডিতে সীমাবদ্ধ।

উৎপাদনের নতুন নতুন হাতিয়ারের সাথে সংযুক্ত শ্রেণী প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে লড়াই করে অতিতের সাবেকী সমাজগুলোর পরিবর্তন সাধন করেছে। তাই শ্রেণী সংগ্রাম যেমন ইতিহাস তেমন সমাজ পরিবর্তনের নিয়মও বটে। বিদ্যমান পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অযোগ্য-অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণী সকল প্রকার অপচেষ্টা এবং জবরদস্তিমূলে এখনো টিকে থাকলেও তার-ই সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণী যখন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরীখে নিজেদেরেকে সজ্জিত ও সুসংগঠিত করতে পারবে তখন সংখ্যা লঘু বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিহাসের নিয়মে যেমন ঠিক তেমন বিজ্ঞানের নিয়মে পরাস্ত হবে। ফলে- সমগ্র মানবজাতি লাভ করবে এক অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক হাদিয়ারদি সমেত এক বৈজ্ঞানিক সমাজ; যেখানে প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী।

অতঃপর, বৈজ্ঞানিক সমাজের সকল বৈজ্ঞানিক মানুষ কেবলই অনুসন্ধান করবে প্রকৃতির নিয়মাদি প্রকৃতিকে জয় করার জন্য। এটাতো ঠিক, আর সাড়ে পাঁচশত কোটি বছর পর সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্য তাপ বিকিরণে অক্ষম হওয়ার অনেক কোটি বছর আগেই পৃথিবী অযোগ্য হবে প্রাণীকুলের অস্তিত্বের সংরক্ষায়। তাই বলে কি মানবজাতি বিলুপ্ত হবে? এ প্রশ্ন এখনই আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু, প্রকৃতি বিজয়ী সমাজতন্ত্রী সমাজ এমনটা হার মানবে তা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য হওয়ার কোনো কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে নাই।

শাহ্ আলম, আগষ্ট, ২০১৫। ঢাকা।